উপসংহার

বক্ষমান গবেষণার পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা উনবিংশ শতকের মহাভারতচর্চার নবদিগন্তকে উন্মোচিত হতে দেখেছি। বাংলা সাহিত্যের কালসীমার প্রথম থেকেই মহাভারতের নবনির্মাণ প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল। মধ্যযুগে তার প্রামান্য দলিল বিভিন্ন কালের অনুবাদগুলির মধ্যে রয়ে গেছে। নাট্যপ্রকরণেও মহাভারত মধ্যযুগে সক্রিয় ছিল কিন্তু বস্তুত নাট্যগীতির ধারায় মধ্যযুগের কোনো তথ্য একালে পাওয়া যায় না। সেজন্য পদ্যানুবাদই মহাভারত চর্চার ধারাকেই একমাত্র নিদর্শন হিসাবে ধরতে হবে। উনিশ শতকে দেখা গেল 'মহাভারত' চর্চা সাহিত্যের প্রকরণের বহু পথে বিকাশ লাভ করল। উনিশ শতক ছিল মূলত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তোরণ দ্বার। হ্যাঁ, মহাভারত চর্চার মধ্যে দিয়েই আধুনিক সাহিত্য চর্চা তার প্রকৃত গতি লাভ করেছিল।

আমার গবেষণার প্রথম অধ্যায় 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারতের পরিচয় সংক্ষেপ'— এ মহাভারতের ত্রিস্তর গঠনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহাভারতের বারংবার নব নবরূপে সৃষ্টির বিশেষত্ব। এই গবেষণা মহাভারতের সেই গঠন প্রক্রিয়ার বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এই ধারাতেই একটা যুগের শেষে সংস্কৃত সাহিত্যে মহাভারতীয় কাহিনিগুলির নবনির্মাণ শুরু হয়ে যায় যে ধারাতে আদি মহাকাব্যগুলি সমগ্র বিশ্বে নবোদ্ভূত ভাষা ও সংস্কৃতিতে সাহিত্যের উপকরণ প্রদান করে এসেছে সেই ধারা এখানে মহাভারতের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। আদি মহাকাব্য বহু দিন ধরে বলা ভালো বহুস্তরে এবং কখনো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা ভৌগোলিকভাবে ভিন্ন রচনার ধারা আদি মহাকাব্য থেকে একটার পর একটা সৃষ্টির উৎসরূপে কাজ করেছে। এই বিষয়টি ইউরোপের হোমারীয় মহাকাব্যদ্বয় এবং ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য। বস্তুত মিথের রচনাধারার সঙ্গে পুনর্নির্মাণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। মিথ নিজে তার অবস্থানে বর্তমান থাকে এবং তার মৌখিক বা লৌকিক কাহিনির ধারায় জীবিত থাকে মিথের নবনির্মাণের ধারা। এর আদি উৎস যেখানে থাকে সেই ইতিহাস পূর্বযুগের ইতিহাস বা বিজ্ঞান পূর্বযুগের বিজ্ঞান থেকে জাত যে আদি মহাকাব্য এবং লোক কথার ধারা এবং এই তিনটি ধারা একত্রে অবস্থান করে মহাকাব্যিক অস্তিত্বকে রক্ষা করে। যে মহাকাব্যগুলির রূপ আছে কিন্তু তার কথ্যরূপ বা সাহিত্যিক সৃষ্টির রূপ বর্তমানে নেই সেই মহাকাব্যগুলি মৃত কারণ মহাকাব্য মানেই সামুহিক বিজ্ঞানের মধ্যে তার প্রণোচ্ছল উপস্থিতি বর্তমান থাকে। যেমন প্রাচীন মহাকাব্য গিলগামেশ কালের অতলে হারিয়ে গেছে লুপ্ত হয়েছে, ফলে লোক কাহিনির সামাজিক

প্রভাব না থাকার জন্য সমাজেও এর নবনির্মাণের চাহিদা লুপ্ত হয়ে গেছে। এককালে অবশ্যই বিশিষ্ট ঈশ্বর বিশ্বাসের চেতনার সঙ্গে সঙ্গে এই মহাকাব্যগুলির সংমিশ্রণ ঘটেছে। ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত সবগুলির সঙ্গেই একথা প্রযোজ্য। কিন্তু লক্ষণীয় ইলিয়াড, ওডিসির ধর্মের অবলুপ্তির পরও তার সাহিত্যিক গ্রহণযোগ্যতা কমেনি।

যদিও রামায়ণ, মহাভারতের ধর্ম যখন যখন তার চেহারা পরিবর্তন করেছে তখন তারাও পরিবর্তিত হয়েছে। বৈদিক যুগের কাহিনি হয়েও বৈদিক কালের দেবতা ভাবনার তুলনায় বড়ো হয়ে উঠেছে রাম ও কৃষ্ণের ভাবনা। এই ভাবনাদ্বয় ভাগবৎ ধর্ম হিসাবে দাঁড়াতে মূলত সাহায্য করেছে ফলে এই কৃষ্ণ ও রামের অবস্থানই কিন্তু পুনর্লিখনগুলির মুখ্য কারণ 'বিশ্বনাথ' মহাশয় যখন তার গ্রন্থে 'ইতিহাসোদ্ভব্য বৃন্তং' লেখেন তখন বুঝতে হবে তিনিও একাধারে এই দুই ভাবনা অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণভাবনার পৌরাণিক ধর্ম প্রসঙ্গ এবং ব্যাসদেবের মহাভারতে কথিত—

"আচখুঃ কাবষঃ কেচিৎ সমগ্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্তুতি তথৈবাণ্যে ইতিহাসমিসং ভুবি।।২৬।।"

এই তথ্যানুসারে মহাভারতকারের দেওয়া অনুমতিকেই নিয়ম হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। মহাভারতের উপরে রচিত কাব্য ও নাটকাদিকে এই সূত্রেই সূত্রায়িত করতে হবে। সংস্কৃতে কাব্য নাটকের সিংহভাগ এই ধারাতেই রচিত। বাংলাতেও সংস্কৃত রচয়িতারা এই ধারাতেই কীচক বধ, হরিচরিতের মতো মহাভারত অনুসারী কাব্য, বেণীসংহারের মতো মধ্যযুগের কালে অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে মহাভারত অনুবাদ বহু পাওয়া গেলেও দুর্লভ হয়ে রয়ে গেছে মহাভারত প্রসঙ্গে রচিত পালাগানগুলি। কিন্তু মৌখিক ধারায় মহাভারতের জীবিত থাকায় প্রশ্নে ঐগুলির গুরুত্ব সর্বাধিক।

বিশ শতকের সাহিত্যের তোরণদ্বার উনিশ শতক। বক্ষমান গবেষণায় দেখা গেছে আধুনিক সাহিত্যে মহাভারতের নবনির্মাণের ধারা বাংলা ভাষার আধুনিককালে প্রকাশিত যার মধ্যে ধরা পড়েছে বিশ্ব সাহিত্যের বিচিত্র প্রকরণের স্বরূপ নবতর ব্যাখ্যা, নতুনতর প্রয়োগ দ্বৈপায়ন ব্যাসের সৃষ্টি একালের নবভাষ্যে ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত বাংলা সাহিত্যের এই অসামান্য সৃষ্টি গুলি। যেখানে দ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারতকে নিয়ে সাহিত্যিকদের অনুবাদিত রচনাধারার মধ্যে কাহিনি ভাষাগত নতুনভাবে নবতররূপে উন্মোচন বাঙালির চেতনার দ্বারকে জাগ্রত করে। প্রবন্ধ সাহিত্যগুলিতে প্রাবন্ধিকগণ তাঁর নিজস্ব মননশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তি দিয়ে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে মহাভারতীয় চরিত্র ও কাহিনিকে নবরূপে সৃষ্টি করেছেন। কাব্যগত দিক থেকে মধুসূদন প্রকরণগত দিক থেকে নবনির্মাণ ঘটালেন। যেখানে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকারা যারা শুধু

মহাভারতের চরিত্র হয়ে না থেকে তাদের অন্তরের কথা পত্রাকারে প্রকাশের সাহস যুগিয়েছে যা উনিশ শতকের নবজাগরণের ব্যক্তিস্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়েছে। অন্যান্য কবিগন মহাভারতীয় চরিত্র ও কাহিনির প্রেক্ষাপটের অন্তরালে পরাধীন ভারতবাসীর মনে নিজের অধিকার আদায়ের নিজেদেরই লড়াই করে গ্রহণ করার মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। মহাভারতের নারী চরিত্রগুলি (দ্রৌপদী, সাবিত্রী) শুধু তাদের দুঃখবেদনা পূর্ণ জীবন নয় 'সাবিত্রী' চরিত্রকে নিয়ে এজন্য তৎকালীন সময়ের বহু সাহিত্যিকরা তাদের রচনা ধারার মধ্যে দিয়ে তাকে শুধু স্বামীর মৃত্যুতে তার বেদনাঘন রূপকে নয়, তাঁকে পুরুষের মত তেজে যমের সঙ্গে লড়াই করার মানসিকতার মধ্যে দিয়ে শুধু গৃহের গৃহবধূ হিসাবে না রেখে তার তেজদীপ্ত চরিত্রকে উন্মোচিত করেছেন। সাবিত্রীর মধ্য দিয়ে ভারতীয় রমণীদের সঙ্গে ইউরোপীয় চরিত্রের পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে 'সাবিত্রী' চরিত্রটির শ্বশুর ও স্বামীর প্রতি তার দায়িত্ববোধকে তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহিত্যিকরা কোনও সময় যমের হিংস্ররূপকে ঢুকে তার চন্দ্য সত্যবাদের জীবনদানের মধ্য দিয়ে সাবিত্রী ও সত্যবানের মিলন ঘটাননি আবার যে সত্যবানকে মহাভারতের ˆাবিদীঢে ঢ়ে়ার উপস্থিতি মৃত্যুর মধ্যেই উপলব্ধ হয়েছিল সেই চরিত্রের মুখে হাশি, ঠাট্টা, প্রেমের ব্যাকুলতা প্রভৃতি দিককে নাট্যকারেরা তাদের রচনার মধ্যে দিয়ে নবনির্মাণে ঘটিয়েছেন। পৌরাণিক নাটক রচনাধারার ক্ষেত্রে প্রথম দিকের নাট্যকারের সংস্কৃত ভাষার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র নাটকের অনুবাদ ধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়ে গিয়েছিল। সেই মনোভাবের পরিবর্তন আস্তে আস্তে ফক্ক ˆরা বেক্ষ নাট্যকারেরা মহাভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে শুধু কাহিনির প্রেক্ষাপস্তুটিকে গ্রহণ করে তাদের মুখের ভাষার গাম্ভীর্য পূর্ণ বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে নবনির্মাণ দান করার চেষ্টা করে গেছেন। এর ফলে তাঁদের সৃষ্ট শাযিঢ্য প্রঁরজ্রে বহু চরিত্রের সমাগম হয়েছে যেখানে প্রধান চরিত্রগুলিকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করার জন্য । গানের ব্যবহার কাহিনির মধ্যে এক অনন্য মাধুর্যতা দান করেছে।

'মহাভারত' চর্চার যে ধারা প্রাক্ আধুনিক যুগে সর্বপ্রথম লক্ষিত হয়েছিল সেই ধারা আরও ব্যপ্তি লাভ করে উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও তার অন্যতম কারণ হল উনিশ শতকের প্রারম্ভে কাশীরাম দাসের মহাভারতের মুদ্রণ। চোখের সামনে পড়ার মধ্য দিয়ে মানুষের পড়ার পাশাপাশি চেতনার দ্বার আরও উন্মোচিত হয়। এইজন্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যিকগণ তাদের নতুন নতুন চিন্তাভাবনাকে তাদের রচনাধারার মধ্যে দিয়ে প্রকটিত করতে পারেন। ভক্তিরসের প্লাবনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, বিহারীলাল প্রভৃতিরা তাদের নাটক রচনা করায় তাদের রচনায় কৃষ্ণের প্রতি তাদের যে মনোভাব তা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন

তাই দেখা যায় আমরা যাকে ক্রোধী মুনি দুর্বাসা হিসাবে চিনি তিনিই 'দুর্বাসার পারণ' নাটকে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে কৃষ্ণের চরণে ভক্তি নিবেদন করছেন। এই রূপের চিত্র নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যেও পরিলক্ষিত হয়। 'যমের' বীভৎস রূপের পাশাপাশি প্রাবন্ধিক চন্দ্রনাথ যমের কোমল মনোভাবকে সাবিত্রী ও সত্যবানের জীবন দানের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন যা একদিকে নবনির্মাণের ধারাকেই প্রকটিত করল। মানুষের চিন্তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনায় যমের দ্বারা সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দেননি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ছোটদের জন্য সাহিত্যিকেরা মহাভারতীয় চরিত্র ও কাহিনিকে তাদের রচনার মধ্যে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা নবনির্মাণ করলেন কারণ তারা ছোটদের মত করে তাদের চাহিদা উপযোগী করে ভাষার গাম্ভীর্য কমিয়ে তাদের জন্য সাহিত্য রচনা করলেন।

তৎকালীন সময়ে যাঁর রচনায় মহাভারতের নবনির্মাণ সবচেয়ে বেশি সার্থকতা লাভ করেছিল তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি তাঁর রচিত কবিতা, কাব্যনাট্য, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নবনির্মাণের ধারাটির ব্যপ্তি ঘটাতে শুরু করলেন এইজন্য মহাভারতীয় চিত্রাঙ্গদা, কাব্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদার পার্থক্য, বিদায় অভিশাপে কচ ও দেবযানীর পারস্পরিক অভিশাপ বর্ষণ না করে কচ চরিত্রটির অনন্যরূপদান এবং পতিতা চরিত্রটিকে বারাঙ্গনা থেকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করণের চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

বক্ষমান গবেষণায় এইবিষয়গুলিকে পরপর সাজিয়ে উনিশ শতকের মহাভারত চর্চা ও নবনির্মাণ ধারার মূল্যায়নের প্রয়াসী হয়েছি। এইটাই এই গবেষণার মূল উপজীব্য। বিশ ও একুশের আধুনিক সাহিত্যের পূর্বজ হিসাবে উনিশ শতকের মহাভারতীয়পূর্ণ দৃষ্টিগুলিকে দেখার চেষ্টা। যা মুখ্যত ভবিষ্যতের সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রকরণের বিভিন্নতা এবং সাহিত্যবর্গের বিচিত্র সৃষ্টিধারাকে চেনাতে সাহায্য করবে। কারণ মহাভারত হল এমন এক মহাসাগর যেখানে বহুভাব একীভূত হয়ে মহান শান্ত রসের প্রতিফলন ঘটিয়েছে এবং এর মধ্যে দিয়েই সত্য হয়ে উঠেছে মহাভারতের বাণী—

"ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ
যদি হাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নতৎ কচিৎ।।"